নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থ : অগ্নি-আখরে লেখা কবিতার স্ফূলিঙ্গ

ড. অনন্য ভট্টাচার্য

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হুগলি মহসিন কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ

ABSTRACT(নিবন্ধের সংক্ষিপ্তসার) : প্রথম প্রকাশিত কাব্য অগ্নিবীণা (১৯২২)-তেই নজরুল ইসলামের কবি প্রতিভার দীপ্তি ও স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্র অনুসারী কবিদের থেকে আলাদা পথ তৈরি করে প্রথম থেকেই বাংলা কাব্য জগতে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিলেন নজরুল। তারই স্বাক্ষর রয়েছে অগ্নিবীণা কাব্যের প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, কামালপাশা, রণভেরী প্রভৃতি কবিতায়। সামাজিক ক্ষত ও ক্লিন্নতা, রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও ভ্রষ্টাচার, অমানবিক রাষ্ট্রিক নীতি – সবকিছুর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী কবিসত্তা কিভাবে এই কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় অগ্নিস্ফূলিঙ্গের মতই দীপ্যমান হয়ে উঠেছে তাই উপস্থাপিত হয়েছে এই প্রবন্ধটিতে।

KEY NOTE ADDRESS (নিবন্ধের মূল বক্তব্য বিষয়ের সংকেত সূত্র) : অগ্নিবীণা কাজী নজরুল ইসলামের সেই কাব্যগ্রন্থ, যা একটি বিশেষ যুগের শুধু নয়, একালেরও সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নানা ধরণের অসঙ্গতি ও অন্যায়কে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত করে। মানুষের প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী চেতনার স্ফূরণে উদ্দীপক হিসেবে বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে এই কাব্যটি। প্রবন্ধটিতে অগ্নিবীণা কাব্যে প্রতিফলিত শোষণ, অত্যাচার, ধর্মান্ধতা ও অমানবিক রীতি নিয়মের বিরুদ্ধে কবি নজরুলের জেহাদ ও লড়াইকে সমকালের প্রেক্ষিতে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

MAIN ARTICLE (মূল নিবন্ধ) :

'বড় কথা বড় ভাব আসে না'ক মাথায় বন্ধু বড় দুখে!

অমর কাব্য তোমরা লিখিও বন্ধু যাহারা আছো সুখে।'[১]

নিজের লেখা কবিতা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি ও জবাবদিহির দায় নিয়ে নজরুল লিখেছিলেন 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাটি। যেখানে নিজেকে 'হুজুগের কবি' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। স্ব-রচিত কাব্য সম্পর্কে তাঁর গর্ব্ বা অহংবোধ ছিল না। কাজেই তাঁর কবিতা চিরস্থায়িত্ব পাবে এমন কোনও বাসনা বা কল্পনা করেননি তিনি কোনদিন। সমসময়ে অভিজাত কাব্যবাসরে তাঁর কবিতা সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছে তুমুলভাবে। প্রায় অশিক্ষিত অসংযমী এক ব্যক্তিকে কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা ছিল তখনকার কাব্য সমালোচকদের। বুদ্ধদেব বসুর মত সমালোচকদের কাছে তাঁর কবিতাচর্চা ছিল অসংযমী অপরিণত বালকের মত। সজনীকান্ত দাস শনিবারের চিঠি পত্রিকায় প্রায় প্রতিমাসে তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে গদ্য ও কবিতা লিখেছেন অবিরত। তারই সরস অথচ যন্ত্রণাদীর্ণ প্রতিক্রিয়া রয়েছে স্বয়ং নজরুলের কবিতাতেই : 'প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন 'তুমি হাঁড়িচাচা'।'[২]

নজরুলের কাব্যপ্রতিভা ও কবিকৃতি নিয়ে অবশ্য ভিন্ন প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে সমকালে। রবীন্দ্র অনুসারী কবিকুলের জগতে তিনি যে এক ব্যতিক্রমী স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত কবি হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছিলেন তা নিশ্চিতভাবেই বুঝেছিলেন অনেকে। তবে তাঁদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও সমাদরেও যে নজরুল বিশেষ আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন এমনটা নয়। বরং এক ধরণের নির্বিকারত্ব ও নির্লিপ্ততা ছিল তাঁর এ বিষয়ে। খ্যাতি ও অখ্যাতি, পুরস্কার ও তিরস্কার, প্রশংসা ও নিন্দা দুইই যুগপৎ ঘটেছে তাঁর জীবনে। এ বিষয়ে তার বক্তব্য ছিল 'কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুজে তাই সই সবই!'[৩]

শতবর্ষ পরেও ভাবীকালের তরুণ-তরুণী, প্রেমিক-প্রেমিকারা তাঁর কবিতা কৌতূহল ভরে পাঠ করবে এমন ভাবনা, বিশ্বাস ও প্রত্যয় ছিল রবীন্দ্রনাথের। '১৪০০ সাল' কবিতায় এমন ভাবনার প্রকাশ হয়েছে নানাভাবে। কেউই হয়তো ভাবেননি নজরুলের লেখা বেশ কয়েকটি কবিতাও শতবর্ষের কালসীমা পেরিয়ে একালে শুধু নয়, চিরকালের কবিতা হিসেবেই জায়গা করে নেবে বাংলার সাহিত্যজগতে ও সারস্বত সমাজে। অগ্নিবীণা কাব্যের কবিতাগুলি সম্পর্কে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। যাবতীয় বিদ্রূপাত্মক সমালোচনার ঝড় সহ্য করেও ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত 'অগ্নিবীণা' কাব্যের কবিতাগুলি আজও আমাদের কালের প্রলেপে মরচে পড়ে যাওয়া চেতনার আগুনকে কখনো স্ফুলিঙ্গের মত কখনও লেলিহান অগ্নিশিখা বা দাবানলের মতোই জ্বালিয়ে তোলে।

অগ্নিবীণা কাব্যে অগ্নির আখরে যে কবি লিখছেন সমকালীন দেশ-কাল-সমাজের সম্পর্কে, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাঁর অন্তরের ক্ষোভ ও দ্রোহের কথা সেই কবিই আবার বীণার ঝঙ্কারে হৃদয়ের স্বতোৎসারিত ও আবেগময় রোমান্টিক দিকটিকে মূর্ত করে তুলেছেন একইসঙ্গে। এই কাব্যগ্রন্থে বিদ্রোহ, বিপ্লব আর রোমান্টিক ভাবনার সম্মিলিত প্রকাশে বিস্মিত পাঠক নিশ্চয়ই মনে মনে ভেবেছেন-অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে!

'অগ্নিবীণা' কাব্যের উৎসর্গ অংশটি বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কবি এই কাব্য উৎসর্গ করেছেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে। উৎসর্গ অংশে লিখেছেন-

'বাংলার অগ্নিযুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর

শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

শ্রী শ্রী চরণারবিন্দেষু'[৪]

এরপর কবি অগ্নিযুগের বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে নিয়ে লিখেছেন একটি কবিতা এবং শেষে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন-

'তোমার অগ্নি পুজারী

স্নেহ-মহিমান্বিত শিষ্য- কাজী নজরুল ইসলাম'[৫]

বলাবাহুল্য অগ্নিবীণা কাব্যটি সমকালের নরমপন্থী, চরমপন্থী, স্বরাজ্যবাদী বা অহিংসবাদী কংগ্রেস দলকে কখনওই তুষ্ট করতে পারেনি। সশস্ত্র বিপ্লবপন্থী একজন আগুন খেকো বিপ্লবীকে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করে আসলে নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকেই স্পষ্ট করেছেন নজরুল। সদ্য যুদ্ধ ফেরত হাবিলদার নজরুল প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তথাকথিত আবেদন-নিবেদন ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে ইংরেজ রাষ্ট্রশক্তির শক্তপোক্ত কাঠামোতে কখনোই চিড় ধরানো যাবেনা এটাই তাঁর বিশ্বাস ছিল। অতএব অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে সরাসরি ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণাতেই সায় ছিল তাঁর। কংগ্রেসের প্রথাগত আন্দোলনের ধারা থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে সরাসরি অগ্নিমন্ত্রে দেশবাসীকে জাগ্রত করার যে ব্রত নিয়েছিলেন অগ্নিপূজারী নজরুল-তারই স্বাক্ষর রয়েছে অগ্নিবীণার উৎসর্গ অংশটিতে।

সবুজের অভিযান কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জীর্ণ জরা ঝরিয়ে চির তারুণ্যকে আহ্বান করেছিলেন জরাগ্রস্ত সমাজের পতন ত্বরান্বিত করার জন্য। অগ্নিবীণার প্রথম কবিতা 'প্রলয়োল্লাস'-এ প্রলয়ের বেশে আবির্ভূত নতুনের জয়ধ্বনি শুনেছেন কবি। যাবতীয় ভয়, জড়ত্ব, আলস্য কাটিয়ে এখন জেগে ওঠার সময়। সমাজের আবর্জনা স্বরূপ যাবতীয় ক্লেদ ও গ্লানি প্রলয়ের অভিঘাতে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাক। ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিক নতুন সমাজ, আবির্ভূত হোক চিরসুন্দরের-এই বক্তব্যই কবিতার প্রাণ।

উপনিষদে আছে 'আত্মানাং বিদ্ধি'। নিজেকে জানো। একই মানুষের মধ্যে রয়েছে বহুমাত্রিক, বহুস্তরিক ও বহুমুখী চিন্তা-চেতনা। বস্তুত এক মানুষের মধ্যেই বহু মানুষের অস্তিত্ব বিরাজমান। আত্মসন্ধানী, শেকড়সন্ধানী মানুষই সেই বহুমুখী সত্তায় বিভাজিত নিজস্ব মানুষকে খুঁজে পায়। আত্ম-এষণায় উৎসুক নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতায় নিজের বহু বিভাজিত সত্তাকে নানারূপে আবিষ্কার করেছেন। বহু বৈপরীত্যময় ভাবনার মধ্যে দিয়ে নিজের যে অখন্ড ও আদিতম সত্তাকে তিনি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছেন তা হল বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী জীবন ভাবনায় সম্পৃক্ত আপসহীন চির-বিদ্রোহী সত্তা, যিনি জীবনের চরমতম সংকটেও বিশ্বাস ও আস্থা হারান না। এক দুর্মর, দূর্দম জীবনাবেগই যার বেঁচে থাকার মূল চালিকাশক্তি। নিজ আদর্শ ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে তিনি শেষ পর্যন্ত আপসহীন, চির লড়াকু এক যোদ্ধা।

এই কবিতায় বারবার তিনি যেটা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন তা হল, তিনি চির বিদ্রোহী এবং বীর। জীবনের কোনও অবস্থাতেই তিনি কাউকে কোনদিন 'বন্ড' দিতে রাজি নন। আত্মবিক্রয় করে আপসহীন বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে নিজেদের সুখ, স্বাছন্দ্য ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আগ্রহী সমকালে সেইসব বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যেই হয়তো নজরুল বলতে চেয়েছেন, তিনি আজীবন এক আপসহীন, দৃঢ়চেতা বিদ্রোহী ব্যক্তি হিসেবেই মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে চান। তাই হয়তো 'বিদ্রোহী' কবিতায় অন্তত ছ'বার পুনরুক্তি দেখি দুটি বিশেষ শব্দবন্ধের-'বীর' ও 'চির উন্নত শির'। বিদ্রোহী কবিতার শেষেও তিনি মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন আমাদের :

'আমি চির বিদ্রোহী বীর

আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির!'[৬]

'অগ্নিবীণা' কাব্যের রক্তাম্বরধারিণী, আগমনী, ধুমকেতু, কামালপাশা, কোরবানি, মোহররম্ সহ সবকটি কবিতাতেই আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের উত্তাপ স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। সেই জ্বালামুখ থেকে কখনও স্বতোৎসারিত হয়ে উঠে আসছে লাভাস্রোত, কখনও দাবানল সদৃশ দাউ দাউ আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে যাবতীয় সামাজিক পচন ও অন্যায়।

আবার অগ্নিবীণা-র কবিতাগুলি থেকেই জন্ম নিচ্ছে ভাবীকালের এক পবিত্র বিশুদ্ধ নিষ্কলুষ সমাজের। অগ্নিবীণা কাব্যের আগুন যেমন প্রলয় ও ধ্বংসের প্রতীক, তেমনই তা পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতারও আর এক রূপ। এই বহুবর্ণের অগ্নিশিখাকে যথার্থভাবে রূপদান করে কাব্যের নামকরণসহ তার অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনাকে চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রচ্ছদ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেদিক থেকে অগ্নিবীণা কাব্য যেন দুই শিল্পীর অনন্যসাধারণ যুগলবন্দি।

REFERENCE (তথ্যসূত্র) :

১. ইসলাম নজরুল, আমার কৈফিয়ত, সঞ্চিতা, ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৯১

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৪. ইসলাম কাজী নজরুল, উৎসর্গ, অগ্নিবীণা, কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র-১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩

৫. প্রাগুক্ত

৬. ইসলাম কাজী নজরুল, বিদ্রোহী, অগ্নিবীণা, কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র-১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৭

REFERENCE BOOK (সহায়ক গ্রন্থ) :

১. ইসলাম কাজী নজরুল, কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র-১, প্রথম প্রকাশ, ২০০১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা